জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka
International Year Of Ecotourism 2002
জুন ২০০২ June 2002
Volume-XIV No. VI ১৪শ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

পর্বতমালা অতিকায়, অথচ ভঙ্গুর

আমাদের জীবনে পর্বতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘ ২০০২ সালকে আন্তর্জাতিক পর্বতবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে

বিশ্বের পর্বতগুলো ধরাবক্ষের জীবনের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের অনেকে আগে ভেবেছি, আসলে সেগুলোর গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে এসব পর্বত মহাসাগরের মতোই প্রাণবন্ত এবং ক্রান্তীয় নিম্নাঞ্চলের বনজঙ্গলের মতো আমাদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মধ্যে প্রতি দশজনে একজন পর্বতবাসী, আর এসব পর্বতই বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের আশ্রয়স্থল। আবার বিশ্বের প্রধান নদ-নদীর পানির উৎসও পর্বত।

প্রতিদিন বিশ্বের প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন মানুষ যে পানি দিয়ে তাদের পিপাসা মেটায়, তার উৎস এই পর্বত। যে ৩শ' কোটি লোক পর্বত থেকে উৎসারিত পরিষ্কার মিঠা পানির অব্যাহত প্রবাহের ওপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে রয়েছে একশ' কোটি চীনা, ভারতীয় ও বাংলাদেশি, ২৫ কোটি আফ্রিকার এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সকল অধিবাসী। পর্বতগুলোকে 'বিশ্বের জলাধার' নামে অভিহিত করার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পানির সঙ্গে মিশে আছে জীবন। আর পর্বতগুলোতে বিদ্যমান সেই জীবনের পরিধি ও বৈচিত্র্যের কথা বিজ্ঞানীরা সবেমাত্র বুঝতে শুরু করেছেন। ক্রান্তীয় বনাঞ্চলসহ বিশ্বের সকল ইকো-অঞ্চলের মধ্যে পার্বত্য জীব-বৈচিত্র্যের স্থান সবার ওপরে। এর কারণ হলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সুউচ্চ বিন্যস্ত খাড়া সারি ও উঁচু-নিচু পরিবেশের জলবায়ু। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে ২০ প্রজাতির উদ্ভিদ বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ খাদ্যের যোগান দিচ্ছে, তার ছয়টির উৎপত্তিস্থল পর্বত। এগুলোর মধ্যে পেরুর আন্দেজ পর্বতে সর্বপ্রথম গোল আলু পাওয়া যায়, ভুট্টা পাওয়া যায় মেক্সিকোর সিয়েরায় এবং জোয়ার পাওয়া যায় ইথিওপিয়ার পার্বত্য ভূমিতে। পার্বত্য ভূমির দূরবর্তিতা অনেক জাতের শস্যকে বিলুপ্ত ও নিঃশেষিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। যেমন আন্দেজে প্রায় দু' শ ধরনের স্থানীয় জাতের গোল আলু রয়েছে। নেপালে রয়েছে প্রায় দু'হাজার জাতের ধান। মেক্সিকোর সিয়েরা ডি মানান্টলানে যে ভুট্টা রয়েছে তা জানামতে বিশ্বের সবচেয়ে আদিম বুনো প্রজাতির।

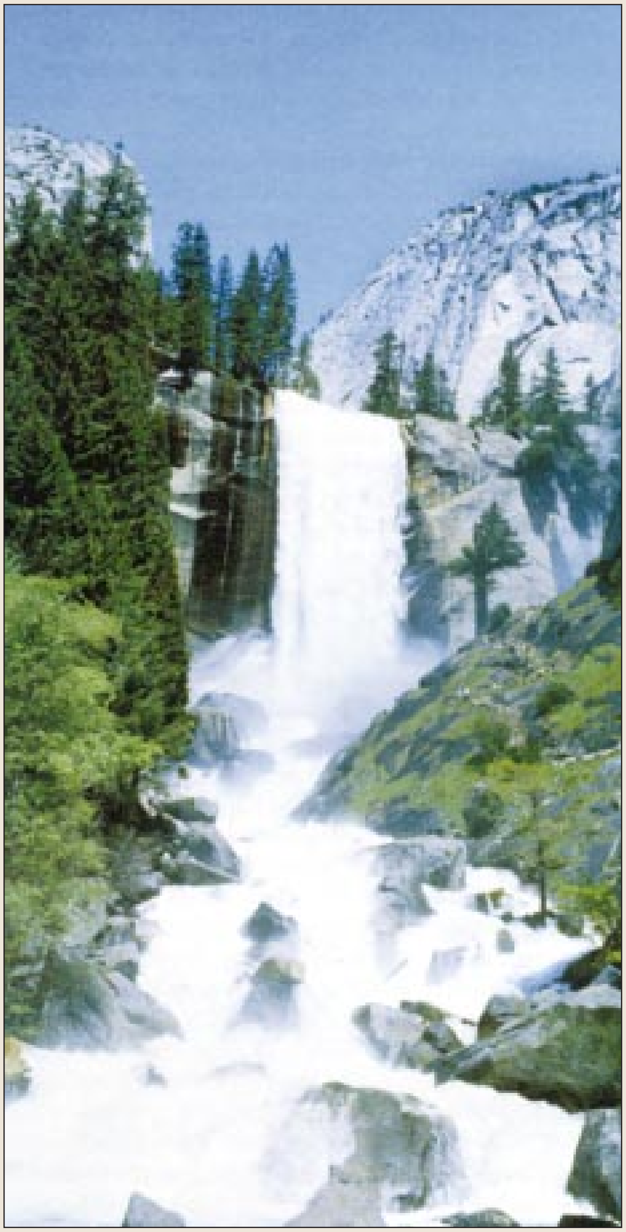

ব্যাপক অবনতি

পার্বত্য ইকো ব্যবস্থায় যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, সেসব ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুরও। বিশ্বের অনেক স্থানে জলবায়ুর পরিবর্তন, দূষণ, শোষণমূলক খনিজ আহরণ, অস্থিতিশীল কৃষি ও পর্যটন পরিবেশের ক্ষতি করছে, যা ব্যাপক অবনতি ঘটাচ্ছে এবং বন্যা, ভূমিধস, তুষারধস ও দুর্ভিক্ষের মতো দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে।

এসব মূল্যবান পার্বত্য সম্পদের অভিভাবক পার্বত্য এলাকার লোকেরা। এ ধরনের পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে তারা। ইতোমধ্যেই পর্বতবাসীরা বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ক্ষুধাপীড়িত ও সবচেয়ে কোণঠাসা মানুষের সারিতে সামিল হয়েছে। বিশ্বের যে ৮০ কোটির বেশি লোক চির অপুষ্টিতে ভুগছে, তাদের অনেকেই পার্বত্য এলাকাবাসী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের খাদ্য অনিরাপত্তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি। অন্যান্য ক্ষেত্রে পার্বত্য চাষীরা সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতি ছেড়ে ভঙ্গুর পার্বত্য ভূমিতে স্থিতিশীল নয় এমন ভিন্ন পদ্ধতি ধরলে অন্নের অভাব দেখা দেয়।

সংঘাত ও যুদ্ধ

তবে, পার্বত্য এলাকায় খাদ্যাভাবের সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি হলো সংঘাত ও যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা। ১৯৯৯ সালে বিশ্বের ২৭টি বড় যুদ্ধের ২৩টিই সংঘটিত হয়েছিল পার্বত্য অঞ্চলে। যেখানে সশস্ত্র সংঘাত হয়, সেখানকার লোক শস্যের আবাদ করার মতো জীবনধারণের জন্য মৌলিক কাজগুলো করতে পারে না। অনেক সময়ই যে সামান্য কিছুটা খাদ্য থাকে তা সৈন্য বা সংঘাতে যারা প্রাধান্য বিস্তার করে, তাদের দখলে চলে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষি জমিতে স্থলমাইন পোঁতা হয়, যা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠাকে বেঁচে থাকার এক দীর্ঘ সংগ্রামে পরিণত করে।

পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রসারে আমরা সবাই কাজ করলে বিশ্বে ক্ষুধা ও অপুষ্টিপীড়িতের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনা যেতে পারে। পার্বত্য এলাকায় খাদ্য অনিরাপত্তা হ্রাসে এখনই সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুৎপীড়িতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার ব্যাপারে ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য পূরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারি।

আমাদের সকলের জীবনে পর্বতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘ ২০০২ সালকে আন্তর্জাতিক পর্বতবর্ষ ঘোষণা করেছে। পর্বতের ইকো ব্যবস্থা রক্ষা এবং পার্বত্যবাসীদের লক্ষ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তাদানে ব্যক্তি, জাতি ও আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে কাজ করার লক্ষ্যে আমাদের সবার জন্য এই বর্ষ এক অনবদ্য সুযোগ এনে দিয়েছে।

সমন্বয়ের ভূমিকা

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) স্থিতিশীল পর্বত উন্নয়নে কাজ করার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক পর্বতবর্ষের জন্য জাতিসংঘের শীর্ষ সমন্বয়কারী হিসেবে এই সংস্থাকেই মনোনীত করা যথার্থ হয়েছে। এই মনোনয়ন ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে গৃহীত স্থিতিশীল উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব নীতিকৌশল এজেন্ডা-২১-এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কর্মব্যবস্থাপক হিসেবে ফাও'র বর্তমান দায়িত্বের পরিপূরক। জাতীয় সরকার, জাতিসংঘ সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় ফাও পর্বতমালা বিষয়ক একটি আন্তঃসংস্থা গ্রুপ আহ্বান করছে, যা পার্বত্য এলাকার সমস্যা

সমাধানে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। এই সংস্থা পার্বত্য ইকো ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং পার্বত্য জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা জোরদারের লক্ষ্যে একটি বিশ্ব যোগাযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ফাও দেশ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পর্বতবর্ষ পালনে জাতীয় কমিটি গঠনেও সহায়তা দিচ্ছে। পার্বত্য এলাকায় পরিবর্তন আনয়নে জাতীয় কমিটিগুলো মূল সহায়ক। এসব কমিটির স্থিতিশীল উন্নয়ন কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তাদের দেশের প্রয়োজন, অগ্রাধিকার ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পর্বত-বান্ধব নীতি ও আইন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের ৫০টির বেশি দেশ জাতীয় কমিটি গঠন করেছে। অনেক কমিটিতে সরকার, সুশীল সমাজ, এনজিও ও বেসরকারি খাত থেকে সদস্য রয়েছে। এসব কমিটি অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমবারের মতো পার্বত্য উন্নয়নের বিষয়গুলোকে কল্যাণধর্মী, দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে রেখে কাজ করছে এবং পাশাপাশি কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমর্থন জোরদার করছে। আমরা যারা খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় আছি তারা বিশ্বাস করি যে, এসব জাতীয় কমিটি পর্বত উন্নয়নে বর্তমান ও ভবিষ্যতে এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করবে।

পার্বত্য পরিবেশের উন্নয়নের জন্য নিম্নভূমি থেকে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, যা সরকারগুলো অনেক সময়

উপেক্ষা করেছে। তাদের সুনির্দিষ্টভাবে পর্বতকেন্দ্রিক গবেষণা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে পর্বতকেন্দ্রিক নীতি ও আইনের প্রয়োজন। কয়েকটি প্রতিশ্রুতিশীল বিশ্ব গবেষণা কর্মসূচি ইতোমধ্যেই চলমান রয়েছে, যা দেশগুলোকে তাদের পার্বত্য এলাকার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পর্বত-বান্ধব নীতি গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। জনগণ ও সংস্থার বিশ্ব নেটওয়ার্ক পর্বত ফোরামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ফোরাম গবেষণা ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব জোরদার এবং সুনির্দিষ্ট বিষয়, ভৌগোলিক সীমারেখা ও সংস্কৃতি অতিক্রম করে তথ্য ও প্রেক্ষিতে বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শূন্যতা পূরণে সহায়তা করছে।

অনেক জাতিসংঘ সংস্থা ও এনজিও তাদের গবেষণা কাজে পর্বতকেন্দ্রিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা পরামর্শ গ্রুপ (সিজিআইএআর) একটি ব্যাপক পদ্ধতিভিত্তিক বিশ্ব পর্বত কর্মসূচি চালু করেছে, যার কর্মকাণ্ডে নতুন হাতিয়ার ও পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পার্বত্য লোকদের ক্ষমতায়ন থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য আদিবাসী জ্ঞান সংরক্ষণের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজন

আমরা যারা খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় রয়েছি, তারা পার্বত্য সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং পার্বত্য ইকো ব্যবস্থা সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। চলতি এই কাজের মধ্যে জল-বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশু উৎপাদন, উন্নয়নে নারীর ভূমিকা, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, নীতি এবং পার্বত্য ইকো ব্যবস্থা ও জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আরো অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ এবং আমাদের গ্রহের সুস্থতা নির্ভর করে পর্বতগুলোর ওপর। ২০০২ সাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর আন্তর্জাতিক পর্বতবর্ষও শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু পার্বত্য ইকো ব্যবস্থা রক্ষা এবং পার্বত্য জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য আমাদের সঙ্কল্প আগামী বছরগুলোতেও বজায় রাখতে হবে।

(জ্যাকস্ দিউফ
খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মহাপরিচালক)

পর্বতমালা : বিশ্বের জলাধার স্তম্ভ

দশজনে প্রায় একজন পর্বতবাসী; কিন্তু পানির উৎসের জন্য দু'জনের মধ্যে একজন পর্বতমালার ওপর নির্ভরশীল। বন উজাড়, অতিমাত্রিক পশুচারণ ও খাড়া পাহাড়ি এলাকায় দুর্বল ব্যবস্থাপনায় ভূমির ব্যবহারে পানি প্রবাহ হুমকির সম্মুখীন হয়, যার ফলে মাটি ক্ষয় হয়। এশিয়া ও আমেরিকায় সাম্প্রতিক বিপর্যয়কর বন্যা থেকে বিস্তীর্ণ এলাকায় পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে পার্বত্য বনাঞ্চলের বিশেষ অবদান পরিলক্ষিত হয়েছে।

পানি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ওপর নির্ভরশীলদের ওপর জল-বিভাজিকার উজানে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, মাটি, গাছপালা ও ভূমি ব্যবহারের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। খাড়া ঢালে দুর্বল চাষাবাদ রীতি গড়িয়ে পড়া পানির জমে থাকা বৃদ্ধি করে। ফলে মাটির ওপরের স্তর ক্ষয় হয়, জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, জলাধারে পলি পড়ে ও আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। ১৯৯৫ সালে পাকিস্তানে এ ধরনের বন্যায় ২৬টি পানিচালিত কলসহ ১২শ' হেক্টরের বেশি কৃষিজমি তলিয়ে যায়। এর তিন বছর আগেও, পাকিস্তানে পার্বত্য ঢলে ৪ হাজার ৬শ' হেক্টর জমির ফসলসহ ১ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়। চীনে প্রতি বছর ভূমিধসে দেড় হাজার কোটি ডলারের ক্ষতি হয় এবং দেড়শ' লোক প্রাণ হারায়।

পরিবেশ রক্ষা ও অর্থনৈতিক চাহিদা একই সঙ্গে সমাধান করতে হবে। এর মধ্যে স্থিতিশীল বনচর্চা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যাতে বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য হয় তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় কৃষকদের সহযোগিতায় তা ঠিক করতে হবে (যেমন কৃষি জমির সঠিক স্তর)। (মানবসহ) বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য তাদের মিথস্ক্রিয়া অনুধাবন করতে হবে। ■

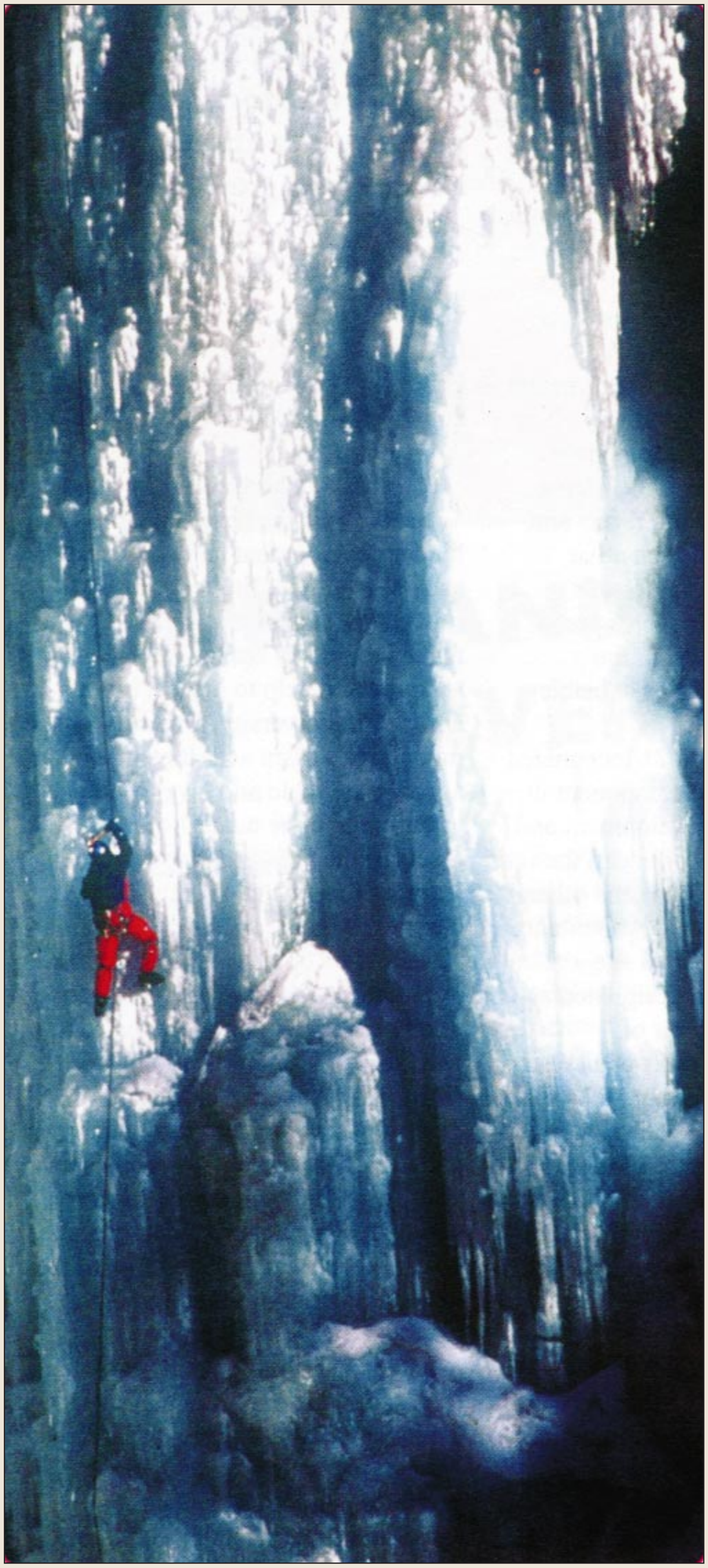

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও বেসরকারি সংগঠন 'লাইফ' যৌথভাবে ধূমপানের বিরুদ্ধে এক সাক্ষর অভিযান শুরু করে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সাক্ষর অভিযানের উদ্বোধন করেন। বক্তব্যদানরত অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী।

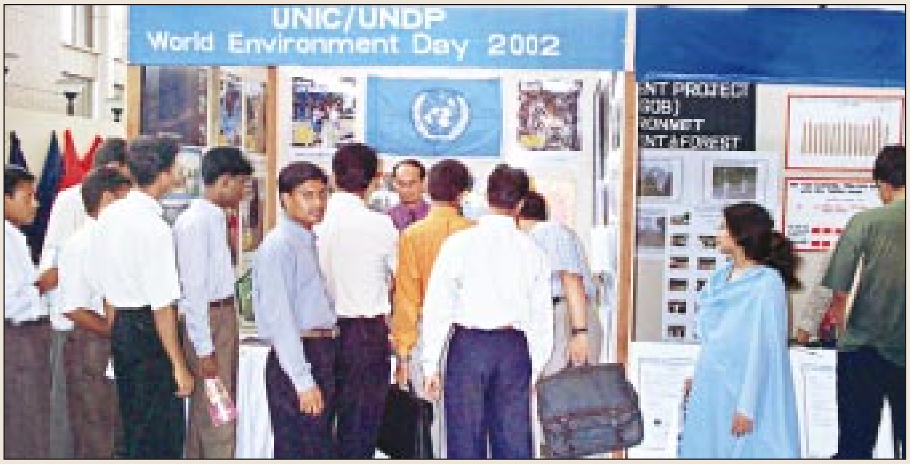

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ইউএনডিপি ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র যৌথভাবে জাতীয় পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মেলার আয়োজন করে বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়। জাতিসংঘের এই স্টল পরিদর্শনার্থীদের একাংশ।

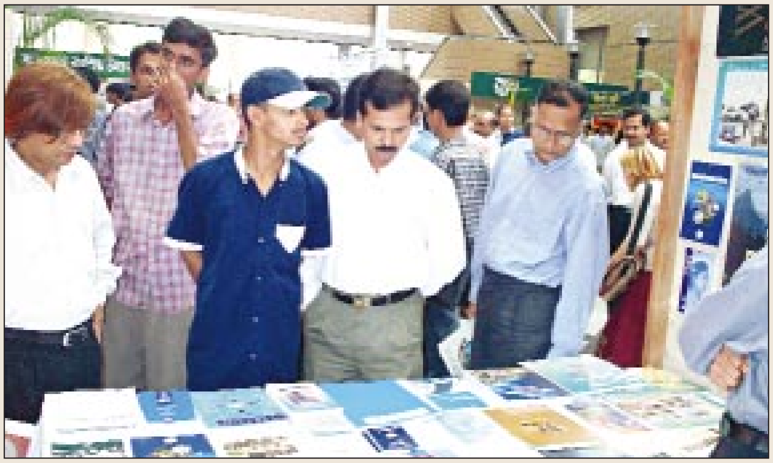

নারী, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

পল্লী এলাকায় বিশ্বের বেশির ভাগ ক্ষুৎপীড়িত লোকের বাস। আর সে এলাকায় স্থানীয়ভাবে যে খাদ্য গ্রহণ করা হয় তার অধিকাংশই উৎপাদন করে নারী। ভূমি, ঋণ ও প্রশিক্ষণের মতো অত্যাবশ্যকীয় সম্পদ ও সেবায় সমান সুযোগ থাকলে নারীর অবদান আরো বেশি হতে পারতো। নারীরা যেসব বাধাবিঘ্ন প্রতিহত করে সেগুলো দূর করাই বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য অর্জনের চাবিকাঠি হতে পারে। অসুবিধা সম্পর্কে নারীর অর্জিত অভিজ্ঞতা ও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অধিকতর ভালো তথ্য এবং পল্লীবালাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতির বিন্যাসেই কেবল তা সম্ভব।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পুরুষের চেয়ে নারী অনেক বেশি সময় কাজ করে। এশিয়া ও আফ্রিকায় জরিপে দেখা গেছে, নারী সপ্তাহে ১৩ ঘণ্টা বেশি কাজ করে।
- পল্লীর নারী ও মেয়েরা খাবার তৈরির জন্য জ্বালানি সংগ্রহ ও পানি টেনে দিনে গড়ে প্রায় এক ঘণ্টা ব্যয় করে। কোনো কোনো সমাজে এসব কাজে চার ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যয় হয়।
- আফ্রিকায় এক জরিপে দেখা গেছে, নারী এক বছরে এক কিলোমিটার দূরত্বে ৮০ টনের বেশি জ্বালানি, পানি ও খামারে উৎপাদিত পণ্য বহন করেছে। পুরুষ খুব বেশি হলে এক-অষ্টমাংশ বহন করেছে, প্রতিবছর এক কিলোমিটারে গড়ে ১০ টন।
- জরিপে দেখা গেছে, নারী কৃষিপণ্য ও হস্তশিল্প বাজারজাত করে যে আয় করে, গৃহস্থালি প্রয়োজন মেটাতে তার প্রায় পুরোটাই ব্যয় করে ফেলে। পুরুষ তাদের আয়ের শতকরা অন্তত ২৫ ভাগ অন্যান্য কাজে ব্যয় করে।

খাদ্য উৎপাদনের চাবিকাঠি নারীর হাতে

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীর বেশির ভাগ কাজ কৃষিতে নিয়োজিত। খাদ্য উৎপাদনের প্রতি ধাপে নারী জড়িত থাকে। পুরুষ সচরাচর জমিতে লাঙল ও পশুচালিত গাড়ি চালায় আর গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের শতকরা ৯০ ভাগের

বেশি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ধান, গম ও ভুট্টার মতো প্রধান শস্য বোনা, আগাছা পরিষ্কার, সার দেয়া ও ফসল তোলার বেশির ভাগ কাজ করে নারী।

শিম ও সবজির মতো ফসলে নারীর অবদান আরো বেশি। এসব ফসলের বেশির ভাগই বাড়ির সবজি বাগানে চাষ করা হয়, যার প্রায় পুরোটাই করে নারী। এসব বাগান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদনশীল এবং পুষ্টি ও অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে, নাইজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলে এক জরিপে দেখা গেছে, পারিবারিক বাগানের পরিমাণ পরিবারের কৃষি জমির শতকরা মাত্র ২ ভাগ হলেও মোট উৎপাদনের অর্ধেক আসে সেই বাগান থেকে। অনুরূপভাবে, ইন্দোনেশিয়ায় পরিবারের আয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশি ও খাদ্যের শতকরা ৪০ ভাগ আসে পারিবারিক সবজি বাগান থেকে।

নারীর ফসলের কাজ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ম্লান করে দিচ্ছে বাধা-বিপত্তি

অত্যাবশ্যকীয় সম্পদ ও সেবায় সমান সুযোগ পেলে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় নারীর অবদান বেশি হতো। অনেক সমাজে প্রথা ও আইনের কারণে নারী ভূমির মালিকানা পায় না। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শতকরা ৬০ ভাগের বেশি নারী শ্রমিক কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলেও উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে, ভারত, নেপাল ও থাইল্যান্ডে শতকরা ১০ ভাগের কম নারীর ভূমি মালিকানা রয়েছে।

জামানত হিসেবে জমি দিতে না পারায় ঋণ সুবিধা থেকেও নারী বঞ্চিত হচ্ছে। আর ঋণ ছাড়া তারা অনেক ক্ষেত্রেই বীজ, যন্ত্রপাতি ও সারের মতো উপকরণ কিনতে পারে না অথবা সেচ ও ভূমি উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে, জ্যামাইকায় কৃষিঋণ ব্যাংকের মঞ্জুরকৃত ঋণের শতকরা মাত্র ৬ ভাগ পায় নারী।

খাদ্য উৎপাদনে নারী যে ভূমিকা পালন করে তা কদাচিৎ স্বীকৃতি পায় বলে নতুন শস্য বীজ ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার জন্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সুবিধা তারা কদাচিৎ লাভ করে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, নারী কৃষকরা বিশ্বব্যাপী সকল কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ সুবিধা পায়। মিশরে কৃষি শ্রমশক্তির অর্ধেকের বেশি নারী হলেও সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের শতকরা মাত্র ১ ভাগ নারী।

বৃক্ষ ও জনগণ

১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বের বনসম্পদের আওতা বছরে ৯৪ লাখ হেক্টর করে কমেছে। এ হিসেবে প্রতিবছর ১ কোটি ৪৬ লাখ একরের প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ নষ্ট হয়েছে, আর প্রাকৃতিক বনের প্রসার ও বনায়ন থেকে প্রতি বছর অর্জন হয়েছে ৫২ লাখ হেক্টর বনভূমি। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোতে বন উজাড় হয় শতকরা ৯৭ ভাগ, আর বনভূমির প্রসার ঘটে শতকরা মাত্র ৩৬ ভাগ। দাবানল, অস্থিতিশীল ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ বনভূমি উজাড়ের কারণ হলেও খাদ্য উৎপাদন ও জীবিকার জন্য গাছপালা কর্তন বন উজাড়ের প্রধান কারণ।

বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নীতিকে মানুষের সুস্থ পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সুফলের প্রয়োজনের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। ব্যবস্থাপনা যথাযথ হলে কেবল বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কাঠের একটা স্থিতিশীল উৎসই নয়, অধিকন্তু খাদ্য, ওষুধ, নির্মাণসামগ্রী ও অন্যান্য প্রথাগত পণ্যের নবায়নযোগ্য সরবরাহের জন্য বনের মূল্য রয়েছে। মূল স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের অঙ্গীকার এবং পরীক্ষিত বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকার প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে সংরক্ষণ, রক্ষা ও বাণিজ্যিক চাহিদার ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।

খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশ

২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা ৮শ' কোটিতে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশের ওপর চাপ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। আগামী বছরগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ হলো বাড়তি ২শ' কোটি লোকের চাহিদা পূরণের মতো পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করা, যার ওপর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরের কল্যাণ নির্ভরশীল।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- জনপ্রতি আবাদযোগ্য জমি কমে আসছে, ১৯৭০ সালে যা ছিল ০.৩৮ হেক্টর তা ২০০০ সালে ০.২৩ হেক্টরে নেমে এসেছে, ২০৫০ সালে তা জনপ্রতি ০.১৫ হেক্টরে নেমে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।
- বিশ্বব্যাপী ভূমির শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ অবনতির জন্য মাটিক্ষয় দায়ী, যার অনেকটাই হচ্ছে চাষাবাদের কারণে।
- উন্নয়নশীল বিশ্বের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ সেচজমি জলাবদ্ধতা বা লবণাক্ততার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- গবাদিপশুর প্রায় ৩০ ভাগ প্রজাতি বিলুপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। ১৯০০ সালের পর কৃষিজ ফসলের শতকরা ৭৫ ভাগ বৈচিত্র্য হারিয়ে গেছে।
- মরুবিস্তারের ফলে প্রায় ২৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রায় ১শ' কোটি লোক ক্ষতির ঝুঁকিতে রয়েছে।
- জৈব উৎপাদন পদ্ধতির আওতাধীন ভূমির পরিমাণ বাড়ছে, বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৫৮ লাখ হেক্টর। এর দু'-তৃতীয়াংশ ভূমি আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ায় এবং অবশিষ্ট ভূমির অনেকটাই ইউরোপে। উন্নয়নশীল দেশে জৈব পদ্ধতিতে শতকরা মাত্র ০.৫ ভাগ জমি চাষ করা হয়।

অপুষ্টির পরিধি

বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ কোনো না কোনো ধরনের অপুষ্টিতে ভুগছে। যারা পর্যাপ্ত শক্তি উপাদান বা মূল পুষ্টিসামগ্রী পায় না তারা সুস্থ, সক্রিয় জীবন টিকিয়ে রাখতে পারে না। এর ফল হচ্ছে বিপর্যয়কর অসুস্থতা ও মৃত্যু এবং মানবিক সম্ভাবনা ও সামাজিক উন্নয়নের অপরিমেয় ক্ষতি। পাশাপাশি, কোটি কোটি লোক অপরিমিত বা সুষম নয় এমন খাবার খেয়ে রোগব্যাধিতে ভোগে। বিশ্বের অর্ধেকের বেশি রোগব্যাধির কারণ ক্ষুধা, সুষম নয় এমন শক্তি উপাদান গ্রহণ বা খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ ঘাটতি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো পুষ্টি পরিধির উভয়দিকে মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা জর্জরিত দেশগুলোর সারিতে দ্রুত সামিল হচ্ছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি পাঁচজনে একজন, অর্থাৎ ৭৭ কোটি ৭০ লাখ লোক চির অপুষ্টির শিকার।
- বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনের নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা সমস্যা অর্ধেক কমিয়ে আনার জন্য ক্ষুধার্তের সংখ্যা বছরে ২ কোটি ২০ লাখ করে হ্রাস করতে হবে। বর্তমানে এই হ্রাসের হার বছরে মাত্র ৬০ লাখ।
- বছরে ১ কোটি ২০ লাখ শিশু মৃত্যুর শতকরা ৫৫ ভাগ অপুষ্টির সঙ্গে জড়িত।
- ২শ' কোটির বেশি লোক অনুপুষ্টি ঘাটতিতে ভুগছে :
  - রক্তস্বল্পতা : ২শ' কোটি লোক, যাদের শতকরা ৫২ ভাগ গর্ভবতী নারী ও শতকরা ৩৯ ভাগ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু;
  - আয়োডিন ঘাটতি : ৭৪ কোটি লোক;
  - ভিটামিন এ ঘাটতি : ১০ থেকে ১৪ কোটি শিশু;
  - বিকাশ রুদ্ধতা : ১৭ কোটি ৭০ লাখ শিশু;
  - জন্মকালীন ওজনস্বল্পতা : শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ শিশু এবং কোনো কোনো স্বল্পোন্নত দেশে শতকরা সর্বোচ্চ ৫০ ভাগ।
- অনুপুষ্টির ঘাটতির ফলে বিশ্বে সামাজিক উৎপাদনশীলতার যে ক্ষতি হয়, কেবল ১৯৯০ সালে তার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৬০ লাখ বছরের উৎপাদনশীল জীবন।

জীবনচক্র জুড়ে অপুষ্টির পরিণতি

ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতির বিরাট প্রতিবন্ধক ক্ষুধা। উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতি পাঁচজনে একজন এই ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত। উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেয়ায় ক্ষুধাজনিত অপুষ্টি এবং মৃত্যু ও রোগব্যাধি প্রত্যেক প্রজন্মের ওপর বারবার নেমে আসছে। ক্ষুধার যন্ত্রণার কোনো শব্দ নেই এবং অনেক সময় তা চোখে পড়ে না : অমনোযোগী চোখে অনেক ক্ষুৎপীড়িতের যন্ত্রণার বাহ্যিক কোনো লক্ষণ ধরা পড়ে না। নিত্যবুভুক্ষু রোগব্যাধি আক্রমণের সুযোগ বাড়ায় এবং মানুষের বোধশক্তি ভোঁতা ও জড়িমাগ্রস্ত করে, কাজের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এর প্রতিফলন ঘটে অর্থনীতিতে এবং এতে বিপর্যয়কর পারিবারিক ক্ষুধা ও দারিদ্র্য চক্র সৃষ্টি হয়। ভিটামিন ও খনিজ ঘাটতির ফলে অনেক শিশু বিকাশ রুদ্ধতা, অন্ধত্ব ও আপোসমূলক মানসিক বিকাশের শিকার হয়। লৌহ ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতায় আফ্রিকা ও এশিয়ায় শতকরা ২০ ভাগ মাতৃমৃত্যু ঘটে।

অপুষ্টি অবশ্য দরিদ্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কিংবা অতিপুষ্টিও বিত্তবানদের জন্য একটা 'বিলাস' নয়। দুর্বল পুষ্টি অর্থনৈতিক সীমারেখা ছাড়িয়ে যায় এবং অত্যন্ত অল্প আহার (অপুষ্টি), অপরিমিত আহার (অতিপুষ্টি) বা সুস্থ জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানবিহীন (অনুপুষ্টি ঘাটতি) সুষম নয় এমন আহারের কারণে স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

অতিমাত্রিক শক্তি উপাদান গ্রহণ, দুর্বল খাদ্যাভ্যাস ও ত্রুটিপূর্ণ বিপাকের ফলে পুরোপুরি ভিন্নতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্থূলকায়ত্ব এবং হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো চিররোগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রুত একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রমাণে আরো দেখা গেছে যে, এসব রোগের প্রকোপ গর্ভাবস্থা ও শৈশবের প্রথম দিকের অপুষ্টির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।

স্বাস্থ্যের সুনির্দিষ্ট পরিণতিতে ভিন্নতা থাকলেও কম ওজন ও বেশি ওজন উভয় ক্ষেত্রেই পীড়া ও অসামর্থ্য, কম আয়ুষ্কাল ও কম উৎপাদনশীলতার বিরাট ঝুঁকি রয়েছে। এর ফল হলো, ইতোমধ্যেই সম্পদের প্রান্তদেশে উপনীত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এখন পুষ্টি পরিধির উভয় দিকেই ক্রমবর্ধমান হারে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০

A Monthly News Bulletin Published by the United Nations Infromation Centre, Dhaka, Bangladesh Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org